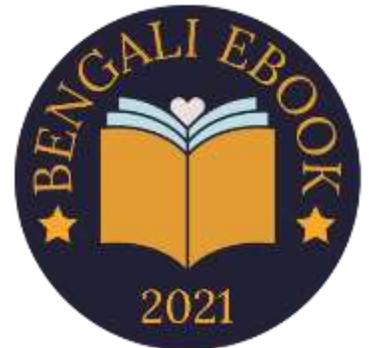


ছোট গল্প

মুকুট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, “দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।”

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, “ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।”

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বটে! ”

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, “হাঁ।”

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক-ফুলানো ভঙ্গি ও তলোয়ারের আশ্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না- হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, “মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে! হজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা - ”

মুকুট

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কৰ্কশ স্বর দ্বিগুণ কৰ্কশ করিয়া কহিলেন, “আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার - তাহা তোমার মনে নাই!”

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, “বস্! চুপ! আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।”

বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, “খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।”

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সম্মুখে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন- হাসিতে হাসিতে বলিলেন- “শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়!” বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

“সত্য নাকি।” বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, “চুপ করো দাদা।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।”

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, “দাদা, চুপ করো বলিতেছি।”

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, “জনাব।”

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, “দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।”

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, “ঠাঞ্জা হও ভাই, ঠাঞ্জা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।”

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “উহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “নাগাল পাওয়া যায় না!”

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন ককর্শ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যিক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান।

রাজবাটীর চাকর-বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর-একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন- ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, “দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।” কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, “ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।”

কিন্তু মহারাজ অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, “সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।”

মুকুট

“মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।”

রাজধর বলিলেন, “আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।”

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, “চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে— আর কোনো কাজে লাগিবে না।”

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।”

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?”

রাজধর বলিলেন, “মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।”

রাজ বলিলেন, “আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিবা।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দস্ত করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই- তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, “তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো- তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।”

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, “দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে- আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?”

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।”

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।”

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে- ব্যথিত হইয়া বলিলেন, “সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শানিত-যাহার উপরে গিয়া পড়ে তাহার মর্মচ্ছেদ করে।”

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, “না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।”

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, “তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।” বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন- মৃদুভাবে বলিলেন, “দাদা, তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।”

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, “তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়।

তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া
কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি!”

ইশা খাঁ পরম হ্রষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন- সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ
চাপড়াইয়া বলিলেন, “যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর
সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে
পারিয়া উঠিবে!”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “না না দাদা, ঠাট্টা নয়- যাইতে হইবে। তুমি না
গেলে কে শিকার করিতে যাইবে!”

যুবরাজ বলিলেন, “আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা
হইয়াছে, উঁহাকে নিরাশ করিব না।”

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, “কেন দাদা,
আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।”

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “সেকী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই
শিকারে যাইতেছি” –

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।”

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল
বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।”

মুকুট

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, “না, দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী! চলো তার আয়োজন করি গো।”

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, ‘ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।’

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, “এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।”

রাজধর বলিলেন, “ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব, তাই এই বেশ।”

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি! আজ তিন ভাই একত্র হইবে! এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।”

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, “না না, তাহা হইবে না— রোজ রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।”

মুকুট

রাজধর বলিলেন, “আজ আবার রাত্রে শিকার।”

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।”

রাজধর বলিলেন, “ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।”

কমলাদেবী কহিলেন, “কোথায় লুকাইব।”

রাজধর । আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, “মন্দ কথা নয় সে তো বড়ো রঙ্গ হইবে।” কিন্তু মনে-মনে বলিলেন, ‘তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।’

“এসো, অঙ্গশালায় এসো” বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অঙ্গশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।”

এ দিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অঙ্গশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।” শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া

মুকুট

দাঁড়াইলেন- হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।” ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, “দেবী, এখন বাধা দিয়ো না – আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।”

কমলাদেবী কহিলেন, “আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “আচ্ছা রাখিব।”

কমলাদেবী বলিলেন, “তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “সে হয় না- এ কথা রাখিতে পারি না।”

কমলাদেবী বলিলেন, “চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না”

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।”

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, “তবে এসো, দেখো’সে।” বলিয়া অঙ্গশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন- দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন- “এ কী, রাজধর অঙ্গশালায় যে।”

কমলাদেবী বলিলেন, “উনি আমাদের ব্রহ্মস্বামী।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।”

রাজধর মনে মনে বলিলেন, ‘তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।’ রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “শিকার করিব? আচ্ছা।” বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল- কুমার বলিলেন, “আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।”

কমলাদেবী বলিলেন, “না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।”

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, “দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।” চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচু-নিচু— লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর- একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল— হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, ‘ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ তো নয়!’ দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের ‘পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল— চারি দিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটাল প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল- গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো উর্দ্ধমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গান্তারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদগণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, “দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।”

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, “চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।”

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, “না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।”

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, “যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।”

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই শত হাত দূরে গোটা পাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া

স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যে দিকে লক্ষ স্থাপিত সে দিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গৌঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন, পাকা ভুরু কুণ্ঠিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষন্ন হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, “দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।”

মুকুট

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।”

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, “কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজা দেখুন।”

রাজধর বলিলেন, “আগে দাদার হউক।”

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।”

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, “তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে- আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।”

রাজধর অস্মানবদনে কহিলেন, “লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।”

যুবরাজ কহিলেন, “না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।”

রাজধর কহিলেন, “হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।” যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

মুকুট

অবশেষে ইশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “ভাই, আমি অক্ষম— আমার উপর রাগ করা অন্যায়— তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।”

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, “দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।”

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, “পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।”

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।”

মহারাজ কহিলেন, “কখনোই না।”

রাজধর কহিলেন, “মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।”

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত- আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, “বিচার করুন মহারাজ!”

ইশা খাঁ কহিলেন, “নিশ্চয়ই তুণ বদল হইয়াছে।”

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তুণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, “পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।”

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, “তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যমকুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।” বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, “ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।” বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ে কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, “মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।”

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, “তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যিক।”

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।”

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, “পুত্র, একি পুত্র। আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস।”

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।”

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, “শান্ত হও ভাই— গৃহে ফিরিয়া চলো।”

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, “পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।” গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, “দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।”

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তুণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তুণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের তুণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন— সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্ত্যাব

মুকুট

ধারণা করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না— কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে পাঠান।”

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিনশো বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখা সমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে

মুকুট

মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারি দিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়েরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দক্ষ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন— কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, “দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যিকের সময় কাজে লাগিবে।”

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, “রাজধর তফাতে থাকিতে চান।”

যুবরাজ কহিলেন, “না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।” ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

মুকুট

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ-অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল- যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে- তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতিকষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন- তীরে উঠিয়া

বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাৎগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরামুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান-নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে—তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নামুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলো কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছু মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, “আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল

মুকুট

তেমনি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।”

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরি ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল— বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারি দিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, “আর বিলম্ব নয়— শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।”

কতকগুলি সৈন্য-সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন— তিনি বলিতেছিলেন— আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয়জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।” এই বলিয়াই হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ

বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন— তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্চু্যত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “হর হর বোম্ বোম্” যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বাম দিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যেরা সহসা এরূপ আক্রমণপ্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তুরীনিবাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, “তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল, দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।” ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য

মুকুট

প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারি দিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কুলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তুরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল— আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, “এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।”

মুকুট

ইন্দ্রকুমার ত্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “যুদ্ধ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।”

রাজধর কহিলেন, “আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।”

যুবরাজ কহিলেন, “রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।”

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, “তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।”

রাজধর বলিলেন, “খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে বোল ফুটিতেছে- কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।”

যুবরাজ বলিলেন, “ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম— রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম- নিজে পরিতাম না।”

মুকুট

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, “ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।” বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল— তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম— তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না— তুমি কিনা বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই— আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম— আমি কি কখনো ভীৰুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না!”

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, “ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না” —

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, “যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব

মুকুট

তাহারই হইবে।” বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, “না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।”

ইশা খাঁ বলিলেন, “তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।” বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, “রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন— রাজধর শাস্তির যোগ্য।”

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, ‘আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিবা।’

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল— রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, “আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।”

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।” চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, “পলাইবই বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমারই ইচ্ছা।”

ইশা খাঁ বলিলেন, “তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।” বলিয়া প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটাইয়া দিলেন। পলাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন— তাঁহার চতুর্স্পার্শে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল, তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাল্হত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায়

ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাতে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাতে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিশ্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ— তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্ত্রের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অশ্বের হেঁষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল— রাতে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারি দিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে— এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন যুবরাজ কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক

মুকুট

হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারি দিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে— আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে “দাদা” বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া “এসো ভাই” বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, “আঃ, বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম— এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।” বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল— মৃদুস্বরে বলিলেন, “মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল!”

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, “পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।”

মুকুট

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, “দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।” বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অন্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন— জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন— তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।